বেলা ফুরাবার আগে

বিভাগ/অধ্যায়ঃ একটি জরিপ ও নৈতিক দৈন্যের চিত্র

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

একটি জরিপ ও নৈতিক দৈন্যের চিত্র

একই সঙ্গে আশ্চর্যজনক এবং হতাশাজনক এক ফলাফল উঠে এসেছে জাতিসংঘের জরিপে। বাংলাদেশ, চীন, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা এবং পাপুয়া নিউগিনির মোট ১০,০০০ পুরুষের সাক্ষাৎকার নিয়ে জানা গেছে, তাদের প্রায় এক-চতুর্থাংশই কোনো না কোনো সময়ে ধর্ষণ করেছে। ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানীর ওপর জাতিসংঘের বড় আকারের জরিপ এটাই প্রথম। জরিপের ফলাফল থেকে অনুমান করা যায়, এশিয়ার এ দেশগুলোতে শারীরিক নির্যাতনের মাত্রা কতটা বেশি। বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও, ৬টি দেশের ১০,০০০ পুরুষের এক-চতুর্থাংশ নিজেরাই স্বীকার করেছে ধর্ষণের কথা।

প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে ধর্ষণ হরহামেশাই হয়ে থাকে। ১০ জনে ১ জন সম্পর্কের বাইরেও অন্য নারীকে ধর্ষণ করার কথা স্বীকার করেছে। জাতিসংঘের এ জরিপকাজে নেতৃত্ব দেয়া সাউথ আফ্রিকার মেডিকেল রিসার্স কাউন্সিলের রেচেল জিউকেস বলেন, এটা এখন পরিষ্কার, সাধারণ জনগণের মধ্যে নারী নির্যাতনের ব্যাপকতা আমাদের ধারণার তুলনায় অনেক গুণ বেশি। গবেষকরা বলছেন, জরিপের ফলাফলের প্রেক্ষিতে নারী নির্যাতনের বিষয়ে আমাদের বর্তমান ধারণায় পরিবর্তন আসা উচিত এবং সে মোতাবেক জরুরি পদক্ষেপ নেয়া উচিত, যেন এটাকে প্রতিহত করা যায়। একই ধরনের জরিপ এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় করা হয়েছিল, যেখানে দেখা গেছে ৪০ শতাংশ পুরুষ নারীকে ধর্ষণ করেছে।

জরিপ ফলাফল রচয়িতারা বলেন, এ ৬টি দেশে এ রকম ফলাফলের পেছনে জৈবিক কামনা চরিতার্থ করার পাশবিক প্রবণতা অন্যতম কারণ। তবে পুরুষদের এ রকম সহিংস আচরণের পেছনে অন্য কারণও রয়েছে। যেসব পুরুষ ছেলেবেলায় নির্যাতনের শিকার হয়েছে বিশেষ শ্লীলতাহানী করার নির্যাতন; তাদের দ্বারা ধর্ষণ হওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশি। গবেষকরা এটাও উল্লেখ করেছেন, এ জরিপের ফলাফল সমগ্র এশিয়া এবং প্যাসিফিক এলাকার জন্য প্রযোজ্য নয়। পাপুয়া নিউগিনির ৬২ শতাংশ পুরুষ জোরপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের কথা স্বীকার করেছে। বাংলাদেশের শহরগুলোতে গ্রাম্য এলাকার তুলনায় ধর্ষণ অপেক্ষাকৃত কম সংঘটিত হয় বলে জানা গেছে। ৯.৫ শতাংশ পুরুষ শহরে এবং ১৪.১ শতাংশ গ্রাম্য এলাকায় ধর্ষণের কথা স্বীকার করেছে। [তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট, বুধবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৩]

বাংলাদেশের অধিকাংশ নারীর পরিবারে অন্তত চারজন পুরুষ রয়েছে। বাবা, ভাই, স্বামী ও ছেলে। ভাবতেও ভয়াবহ লাগে যে এদের একজন ধর্ষক হয়ে উঠতে পারে। সহকর্মী, প্রতিবেশি, বন্ধুবান্ধব, শিক্ষক, চেনাজানা, আত্মীয়, পরমাত্মীয় পুরুষদের চেহারা মনে পড়ছে আমার। তাদের মধ্যে প্রতি চারজনে একজনের কি ধর্ষক হওয়া সম্ভব?

খবরটি নিশ্চয়ই চোখে পড়েছে অনেকেরই। যাদের চোখ এড়িয়ে গেছে তাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, এশিয়ার ছয়টি দেশে চালানো এক জরিপের ফলাফল বলছে, প্রতি দশজনের মধ্যে একজন পুরুষ জীবনে ধর্ষণের মতো অপরাধ

করেছেন।

ওই ছয়টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে। ল্যানসেট গ্লোবাল হেলথ নামে প্রতিষ্ঠানের চালানো জরিপে আরও দেখা যাচ্ছে নারীরা তাদের ঘনিষ্ঠজন দ্বারাই নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন বেশি। পরিসংখ্যানের হিসেবে চারজন মানে অবশ্যই এই নয় যে প্রতি পরিবারে কেউ না কেউ ধর্ষক হবে। দশটি পরিবারে একজন ধর্ষকও না থাকতে পারে আবার একটি পরিবারের সকল পুরুষই ধর্ষক হতে পারে?

না, বাংলাদেশের পুরুষরা এখনও পাপুয়া নিউগিনি, চীন, কম্বোডিয়ার পুরুষদের মতো ‘খারাপ’ হয়ে উঠতে পারেনি, কিন্তু তারপরেও অচেনা নারীকে ধর্ষণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এই হার গবেষকদের অনুমানের চেয়ে বেশি।

খবরটি পড়ে আমাদের প্রথমে মনে হয়েছে, না না এটা অসম্ভব, আমাদের দেশের মানুষ কখনও এত খারাপ হতেই পারে না। কিন্তু কথাটি মুখে উচ্চারণের আগেই মনে পড়েছে সংবাদপত্রের বেশ কয়েকটি শিরোনামের কথা। শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রী ধর্ষণ, প্রতিবেশি যুবকের দ্বারা শিশু ধর্ষণ, কর্মক্ষেত্র থেকে বাড়ি ফেরার পথে গার্মেন্টসকর্মী ধর্ষণ, বখাটেদের দ্বারা কিশোরী ধর্ষণ, আত্মীয় দ্বারা গৃহবধূ ধর্ষণ, প্রেমিক কর্তৃক দলবল নিয়ে প্রেমিকাকে গণধর্ষণ, গৃহকর্তা কর্তৃক গৃহকর্মী ধর্ষণ, ‘দ্বারা’, ‘দিয়া’, ‘কর্তৃক’, ‘এ’- করণ কারকে সকল বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায় সংবাদ শিরোনামে। এমন একটি দিনও যায় না যেদিন কোনো না কোনো নারীর ধর্ষণের শিকার হওয়ার খবর না থাকে।

আমাদের ‘ভালো’ পুরুষদের এই কীর্তিগুলোর কথা মনে পড়ায় তাদের পক্ষে বলার যুক্তিগুলো দুর্বল হয়ে পড়ল। বরং মনে হলো জরিপে যা বলা হয়েছে প্রকৃত সংখ্যা তার চেয়ে বেশি। মনে পড়ছে ম্যারিটাল রেপের কথা, মনে পড়ছে চারদেয়ালের ভিতর সংঘটিত অসংখ্য ধর্ষণের কাহিনি যেখানে সামাজিক সম্মান হারানোর ভয়ে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতেই কেঁদে গেছে। জরিপের বাকি পাঁচটি দেশের পুরুষদের কথা বাদ দিয়ে বাংলাদেশের পুরুষদের কথা একটু আলোচনা করা যাক।

কেন এদেশের পুরুষদের মধ্যে এই ধর্ষণপ্রবণতা? এটা কি নারীর অধস্তন অবস্থানের কারণে? আমার কাছে সবচেয়ে বড় কারণ মনে হয় নারীর বর্তমান বিশ্বজনীন অবস্থান ও মানসিকতা। নারী যখনই নিজেদেরকে পুরুষের সমকক্ষ বা সর্বক্ষেত্রে পুরুষদেরকে টক্কর ও টেক্কা দেয়ার পরিকল্পনা আঁটছে, তখন থেকেই তারা পুরুষের ব্যবহারসামগ্রী ও লাঞ্ছনাকর নর্দমায় নিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং ধর্ষণের প্রবণতা জঘন্যমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

ধর্মীয় মূল্যবোধ, ইসলামের আদর্শ ও ভাবনা এবং নারীর প্রতি ইসলামপ্রদত্ত সম্মান প্রদানে অনীহার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে ধর্ষণের সংখ্যাধিক্যের একটি মূল কারণ হল ধর্ষণবিরোধী কঠোর আইন থাকা সত্ত্বেও তার কঠোর ও যথাযথ প্রয়োগের অভাব। অপরাধের সংঘটন এবং তার শাস্তি বাস্তবায়নের মধ্যে যোজন যোজন দূরত্ব। ধর্ষণের শিকার একজন নারী যে মেডিকেল পরীক্ষার সম্মুখীন হন তা দ্বিতীয়বার ধর্ষিত হওয়ার নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। নারীর ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য নেই কোনো নারী চিকিৎসক।

ফলে ধর্ষণের শিকার ট্রোটাইজড একজন নারী ও তার অসহায় আত্মীয়-স্বজন অনেক সময় পরীক্ষার ধরন দেখেই আর আইনের আশ্রয় নিতে চান না। তারা মনে করেন, ‘যা হওয়ার তা তো হয়েছেই, আর কেন দ্বিতীয়বার হয়রানি হওয়া’। ধর্ষণের শিকার নারীর মেডিকেল পরীক্ষা, তার আইনের দ্বারস্থ হওয়ার প্রক্রিয়া এত বিঘ্নময় ও দীর্ঘসূত্রীতা- সামাজিক সংকোচ কাটিয়ে ওঠা এতই কঠিন এবং আইনের সাহায্য পাওয়ার প্রক্রিয়া এত গ্লানিকর যে, মেডিকেল পরীক্ষা, থানা-পুলিশ, কোর্ট-কাচারির ঝক্কি পোহাতে আর চান না অভিভাবকরা।

তাছাড়া অধিকাংশ ধর্ষণের শিকার নারী দরিদ্র পরিবারের হওয়ায় আইনের আশ্রয় নেওয়া বা তার ব্যয় বহন করা হয়ে ওঠে দুঃসাধ্য। তার ওপর থাকে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য প্রভাবশালী ধর্ষকের ভয়ভীতি প্রদর্শন। যা অনেক ক্ষেত্রে শুধু ভয় দেখানোতে থেমে না থেকে ধর্ষিতার পরিবারের অন্য সদস্যদের ওপর হামলায় পর্যবসিত হয়।

ধর্ষণ সম্পর্কে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও আমাদের দেশে ধর্ষণের সংখ্যাধিক্যের একটা বড় কারণ। ধর্ষণ যে একটি গুরুতর আইনগত অপরাধ এবং এর কঠোর শাস্তি রয়েছে তা ধর্ষণকারীর মনে জায়গা করে নেয়নি এখনও। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্ষণকারী মনে করে নির্যাতনের শিকার নারীটি মুখই খুলবে না এবং এই অপরাধের কোনো বিচার বা শাস্তি হবে না। আর একবার ধর্ষণ করে শাস্তি এড়াতে পারলে তার মধ্যে দ্বিতীয়বার অপরাধ করার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার দরবারে জবাবদিহিতা কিংবা নারীর সতীত্বহানীর ভয়াবহ পাপ ও অপরাধবোধ মোটেই কাজ করে না।

আবার দেখা যায়, গ্রাম্য সালিশে শরীয়তের পরিভাষা কিংবা শরীয়তের নামে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে ধর্ষককে সামান্য জুটাপেটা বা অর্থ জরিমানা করে ছেড়ে দেওয়া হয়। তিরস্কার করা হয় ধর্ষণের শিকার নারীকেই। অথচ বিষয়টি যদি ব্যভিচার না হয়ে কেবলই ধর্ষণ হয়, অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট নারীকে জবরদস্তিমূলক এবং প্রকৃতই তার অনিচ্ছায় কাজটি সংঘটিত করা হয় তবে সে নিন্দা কিংবা তিরস্কারের যোগ্য নয়। আবার কখনও কখনও ধর্ষকের সঙ্গে ভিকটিমের বিয়ের আয়োজন করা হয়। এ সবই গুরুতর অপরাধের গুরুত্ব হ্রাস করে জনমনে একে একটি হালকা অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে।

ভিকটিমের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও খুবই অনুদার ও প্রতিকূল। কোনো নারী ধর্ষণের শিকার হলে সমাজে তার অবস্থান হয়ে পড়ে ভীষণ নাজুক। অবিবাহিত হলে ভবিষ্যতে তার বিয়ে হওয়া দুষ্কর হয়। আর বিবাহিত হলে স্বামীর সংসার থেকে বিতাড়নের আশঙ্কা থাকে প্রবল। সমাজে সর্বত্র নারীটিকে হেয় চোখে দেখা হয়।

ফলে গুরুতর আহত না হলে ভিকটিম ও তার পরিবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটনা চেপে যাওয়া নিরাপদ বলে মনে করে। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে অধ্যয়নরত নারীদের প্রতিও এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুদারই থাকে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নব্বই দশকের শেষার্ধে ধর্ষণের শিকার ভিকটিমদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

এমনকি সম্প্রতি ভিকারুন নিসা স্কুলে যে সাহসী মেয়েটি নির্যাতনের বিচার চেয়েছে, তার আগে অন্য যারা নির্যাতনের শিকার হয়েছে তারা কিন্তু সাহস করে মুখ খুলতে পারেনি। নারীর প্রতি সামাজিক অনুদার দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই ভিকটিম সাহস করে বিচার চায় না, বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় ধর্ষক আর বাড়তে থাকে অপরাধ সংঘটনের সংখ্যা।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলতে চাই। নারীর পোশাক-আশাক যে পুরুষকে প্রলুব্ধ ও পাপকর্মে লিপ্ত করার ক্ষেত্রে সবিশেষ ভূমিকা রাখে তার জ্বলন্ত প্রমাণ বর্তমানের ব্যভিচারের আধিক্য। আজ সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই ক্রিয়া কাজ করছে যে, 'মেয়েরা যেমন পোশাক-আশাক পরে তাতে শুধু পুরুষের আর দোষ কী, তারা তো প্রলুব্ধ হবেই।'

তবে পোশাক-আশাক ধর্ষণ ও ব্যভিচারের অনুকারণ হলেও মূল কারণ নয় অবশ্যই। কেননা ধর্ষণের মাত্রা শুধু তরুণী কিংবা যুবতীদেরকেই আক্রান্ত করছে না; বরং তিন, চার বা পাঁচ বছরের শিশুরাও তো ধর্ষিত হচ্ছে। তাদের পোশাকের শালীনতা আর অশালীনতার কী আছে?

আরও একটি কথা এই যে, নারী-পুরুষে বর্তমানে চলছে স্নায়ু যুদ্ধ। মেধায়, যোগ্যতায় এবং ক্ষমতা ও ক্ষমতায়নে

নারীরা পুরুষকে ছাড়িয়ে যাওয়ার একটা অদৃশ্য যুদ্ধ শুরু হয়েছে। যা পুরুষের সঙ্গে নারীর স্নায়ুযুদ্ধ বললেও ভুল হবে না। জৈবিক আকাঙ্ক্ষা থেকে ধর্ষণ খুব কম কম ক্ষেত্রেই ঘটে। অধিকাংশ ধর্ষণের পেছনে কাজ করে নারীর ওপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণকামিতা ও ক্ষমতা প্রদর্শনের মানসিকতা।

ধর্ষণের মতো অপরাধকে সমাজ থেকে নির্মূল করার জন্য প্রথমেই চাই আল্লাহর বিধানের যথাযথ বাস্তবায়ন ও শরঈ আইনের কঠোর প্রয়োগ। দ্বিতীয়তঃ ভিকটিমের আইনগত আশ্রয় গ্রহণের পদ্ধতি সহজ করা এবং বিচার পাওয়ার প্রক্রিয়ায় তার প্রবেশাধিকার। তৃতীয়ত, নারীর প্রতি পুরুষের এবং পুরুষের প্রতি নারীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন।

একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন ধর্ষণকারী কিন্তু ভিনগ্রহ থেকে আগত কোনো জীব নয়, সে আমাদেরই কারও না কারও আত্মীয়, কারও না কারও সন্তান, কারও ভাই, কারও স্বামী। শৈশব থেকেই যেন পরিবারের ছেলে সন্তানটি নারীকে সম্মান করতে শেখে, তাকে সমপর্যায়ের ভাবতে শেখে। ইসলামী তালিম-তারবিয়াত ও নারীকে সম্মান করার শিক্ষা যদি সে পরিবার থেকে পায়, নারীকে ভোগের পণ্য হিসেবে না ভেবে সে যদি ব্যক্তি হিসেবে ভাবতে ও সম্মান করতে শেখে, অধীনস্থ না ভেবে নিজের সমপর্যায়ের ব্যক্তি হিসেবে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল্য দিতে শেখে তাহলে সে কখনও ধর্ষণকারী হয়ে উঠবে না।

ধর্ষণ নারীর একার সমস্যা নয়। এটা গোটা সমাজের সমস্যা, রাষ্ট্রের সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের দায় যেমন রাষ্ট্রের, তেমনি প্রতিটি নাগরিকের। প্রতি চারজনে একজন নয়, দেশের একজন পুরুষকেও ধর্ষক হিসেবে দেখতে চায় না বাংলাদেশ।

নারী ধর্ষণ এবং যেনা-ব্যভিচার আশঙ্কাজনকহারে বৃদ্ধি পাওয়ার মূল কারণ অনৈতিকতা, ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধের নিদারুণ অভাব এবং নারীর ঘর ছেড়ে বাইরে আসা। এই সমস্যাগুলো দূর করতে না পারলে আমরা হারাবো আমাদের মুসলিম পরিচয়। জাতিসংঘের জরিপে এদেশের জনগণ শুধুই পরিচিত হবে ধর্ষক হিসেবে। প্রতি চারজনে যদি একজন ধর্ষক থাকে তবে ‘কে ধর্ষক নয়?’ এই প্রশ্ন বিব্রত ও লজ্জিত করবে দেশের প্রতিটি নাগরিককে! নারীসত্তা যদি তার আপন নীড়ে বেড়ে ওঠে স্বমহিমায় তবে বেঁচে যাবে তারা নিজেরা; বাঁচবে পুরুষরাও!

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=10598

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন